জিম্মি বাংলাদেশ

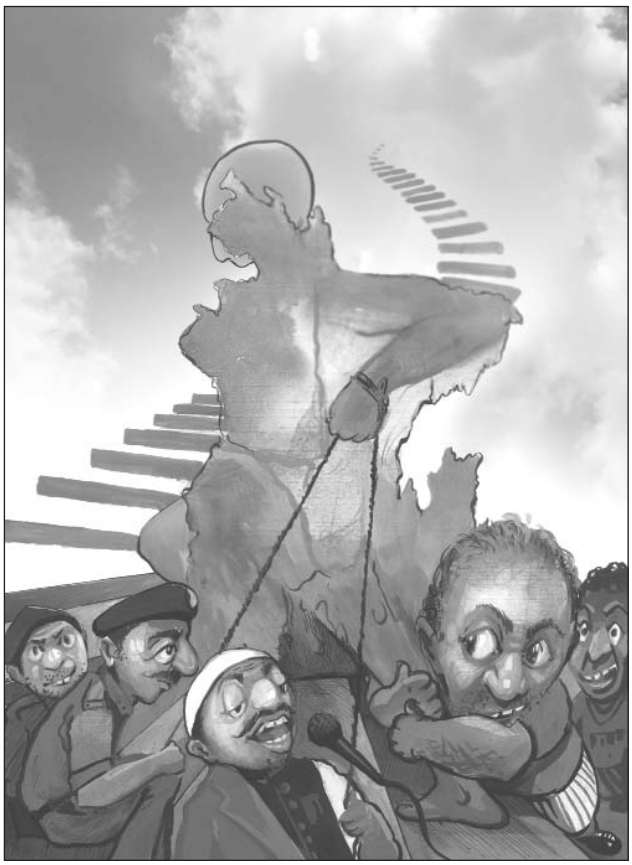

'ইউটোপিয়া' শব্দটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। এই গ্রিক শব্দটির অর্থ 'কোথাও না'। অর্থাৎ যার অস্তিত্ব কোথাও নেই। তবে আছে বা থাকা সম্ভব কল্পনায়। পাঠককে সেই ইউটোপিয়া জগতের গল্প শোনাতে চাইছি। আমাদের ইউটোপিয়া জগতের নাম 'বাংলাদেশ'। যে দেশটি বহু কিছুর বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে, সেই দেশটিতে এখন প্রতিদিন নিহত হয় ৫ থেকে ৭ জন মানুষ। সন্ত্রাস নামক শব্দটি আমাদের অক্টোপাসের মতো জাপটে ধরেছে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি এখন আমাদের যাপিত জীবনের অংশ। এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় মাস্তানমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। সত্যি সত্যি যদি মাস্তানমুক্ত হয়ে যেত তাহলে কেমন হতো সেই বাংলাদেশ?

মানুষ নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায় দিনে-রাতে চলাচল করতে পারতো। ব্যবসায়ীকে চাঁদা দিতে হতো না। চাঁদা দিতে না হলে মানুষের জীবন নিরাপদ থাকতো। ছোট একটি গল্প বলি। মিরপুর অঞ্চলের ঝুট ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামান চৌধুরী। ৮৫ হাজার টাকা দিয়ে কিছু শার্ট কিনলেন একটি গার্মেন্টস থেকে। যে শার্টগুলো বঙ্গবাজারে বিক্রি হয় ১০০ থেকে ১২০ টাকায়। কিন্তু রোকনুজ্জামান চৌধুরী যে দাম দিয়ে শার্টগুলো কিনলেন তাতে প্রতিটির মূল্য পড়লো ২৫ থেকে ৩০ টাকা। তাহলে কী ২৫-৩০ টাকার শার্ট বিক্রি হয় ১২৫ টাকায়? না বিষয়টি তেমন নয়। গার্মেন্টস থেকে ঝুট হিসেবে শার্ট কেনার পর ট্রাকে তুলে বঙ্গবাজারে আনার পথে মিরপুর থানাকে দিতে হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। কালা জাহাঙ্গীর বাহিনীকে দিতে হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। পথে পুলিশ বাবদ আরো ব্যয় হয়েছে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। বঙ্গবাজার পর্যন্ত আসতে ৮৫ হাজার টাকার 'ঝুট'-এর দাম পড়েছে ১ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। এর ওপর কিছু লাভ করে তিনি বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছেন। বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ীও চাঁদা দিয়েছে এলাকার মাস্তান ও পুলিশকে। অর্থাৎ পুলিশ এবং মাস্তানকে যদি চাঁদা দিতে না হতো তাহলে ১২৫ টাকা দিয়ে এখন যে শার্ট কিনছি সেই শার্টটি কেনা সম্ভব ছিলো ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। একইভাবে একটি জিন্সের প্যান্ট কেনা যেত ১০০ থেকে ১৫০ টাকায়। এখন যে টি-শার্ট কিনছি ৬০ টাকা দিয়ে, সেটা কেনা যেত মাত্র ২০-২৫ টাকায়। অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য, এটাই বাস্তবতা।

শাক-সবজি, ফলসহ সব রকম তরিতরকারির দাম সব সময়ই আকাশমুখী, যা ভরা মৌসুমেও পাতালমুখী হতে চায় না। কারণ কী? এরও কারণ সেই চাঁদাবাজি। সারা দেশ থেকে কাঁচা তরকারি ঢাকায় এসে পৌঁছায়। আসে নৌ-সড়ক উভয় পথেই। প্রতিটি ঘাটে চাঁদা দিতে হয় পুলিশ এবং মাস্তান বাহিনীকে। সড়ক পথেও চাঁদার ঝুলি হাতে বসে থাকে পুলিশ বাহিনী। এই হিসাব বাদ দিয়ে শুধু শ্যামবাজার থেকে নিউমার্কেট পর্যন্ত আসতে এক কেজি পটলের পেছনে পুলিশ এবং মাস্তান বাহিনীর চাঁদা বাবদ ব্যয় হয় ২ থেকে ৩ টাকা। নিউমার্কেটে ব্যবসা করার জন্য ব্যয় হয় আরো ১ থেকে দেড় টাকা। এই চাঁদাটা সাধারণত এলাকার কমিশনারের পকেটে যায়। অর্থাৎ এখন যে পটল ১৬ টাকা কেজি দামে কিনতে হচ্ছে, চাঁদা দিতে না হলে সেই পটল কেনা যেত ১২ টাকায়। ঢাকার কারওয়ান বাজারসহ সব বাজারের চিত্র একই রকম। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এই প্রভাবশালী নেতা ৫ কেজির পাল্লা প্রতি পেত ৫ টাকা। এখন সেই স্থান দখল করেছে এক বা একাধিক বিএনপি নেতা। বাংলাদেশের মাছের বড় একটি অংশ আসে ভারত এবং মিয়ানমার থেকে। এর প্রায় পুরোটাই আসে চোরাচালান হয়ে। ভারত বা মিয়ানমারের যে রুই মাছ ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়, ঢাকার বাজারে সেই একই মাছ বিক্রি হয় ১২০ থেকে ১৪০ টাকা কেজি। মাছের দাম এতো কীভাবে বাড়ে? এ কথার উত্তর– চাঁদার কারণে। প্রথম চাঁদা নেয় বিএসএফ এবং বিডিআর। বাংলাদেশে ঢুকে যাওয়ার পর চাঁদা নেয়ার জন্য বসে থাকে পুলিশ এবং স্থানীয় মাস্তান। সীমান্ত এলাকা থেকে ঢাকা পর্যন্ত আসার পথে সবচেয়ে বড় চাঁদাবাজ পুলিশ। রাস্তার মাস্তানদের চাঁদা তো আছেই। চাঁদা দিতে না হলে রুই মাছের কেজি হতো ৬০ থেকে ৭০ টাকা।

ভারত থেকে আসা গরু আমাদের মাংসের চাহিদার সিংহভাগ মেটায়। সীমান্ত পার হয়ে ঢাকা পর্যন্ত আসতে একটি গরুর পেছনে চাঁদা বাবদ ব্যয় হয় ২ থেকে ৭ হাজার টাকা। চাঁদা নেয় বিডিআর, পুলিশ এবং মাস্তান বাহিনী। মাস্তান বাহিনী ঘাট ইজারা নেয়ার নামে করে চাঁদাবাজি। বিডিআর-

পুলিশ তো চাঁদাবাজির লাইসেন্স!

এখন ঢাকার বাজারে ১ কেজি গরুর মাংসের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকা। চাঁদাবাজি না থাকলে দাম কমে আসতো ৫০ থেকে ৬০ টাকায়। কোরবানির ঈদের সময় বিডিআর-পুলিশ-মাস্তান বাহিনীর চাঁদার পরিমাণ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। পরিণতিতে ১০ হাজার টাকার গরু ক্রেতাকে কিনতে হয় ১৫ থেকে ১৮ হাজার টাকায়।

আমাদের পরিবহন সেক্টরের অবস্থা যাচ্ছেতাই। সেবার মান বলতে কিছু নেই। প্রয়োজনের তুলনায় যানবাহন কম, যা আছে সেগুলোর অবস্থাও সুবিধার নয়। একজন ব্যবসায়ী ইচ্ছে করলেই বাস ব্যবসা শুরু করতে পারে না। একটি প্রভাবশালী চাঁদাবাজ চক্রের নিয়ন্ত্রণে পরিবহন সেক্টর। তারা চাঁদাবাজি করছে ফ্রি স্টাইলে। বর্তমান সরকারের দু'জন প্রভাবশালী মন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ করছেন পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজি। পরিবহন ব্যবসায় আসার মতো মানুষের অভাব নেই দেশে। তারা আসতে পারছেন না শুধু চাঁদাবাজির কারণে। পুলিশ-মাস্তানের চাঁদাবাজি না থাকলে পরিবহন সেক্টরে সেবার মান বাড়তো। ভোগান্তি দূর হতো জনমানুষের। ভাড়াও বাড়তো না বরং কমতো।

বাংলাদেশে উল্লেখ করার মতো কোনো বিদেশী বিনিয়োগ আসে না। কারণ আর কিছু নয়, সেই চাঁদাবাজি। এই চাঁদাবাজির পেছনে সমানভাবে দায়ী রাজনীতিবিদ এবং আমলা। এই দুটি শ্রেণী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নাজেহাল করে। যে কাজ ৩ ঘন্টায় হওয়ার কথা সে কাজের জন্য সময় নেয় ৩ মাস। অর্থ দিলে কাজের গতি দ্রুত হয়, না দিলেই হয় এই পরিণতি। রাজনীতিবিদ, আমলাদের এই চাঁদাবাজির নাম 'ঘুষ'। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যেহেতু ঘুষ দিতে রাজি হয় না, সে কারণে আটকে যায় তাদের কাজ। সম্প্রতি জাপান এরকম একটি অভিযোগ করেছে। কিছুদিন আগে নৌ-পরিবহনমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ এনে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলো ডেনমার্ক।

ঘুষ নামক চাঁদাবাজি বন্ধ করা গেলে দলে দলে বিদেশী বিনিয়োগকারী আসতো বাংলাদেশে। বদলে যেত মানুষের জীবনচিত্র।

আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাস্তানির শিকার। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'পুলিশ' মাস্তান, চাঁদাবাজ। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'বিডিআর' মাস্তান, চাঁদাবাজ। মাস্তান, চাঁদাবাজ মন্ত্রী এবং আমলারাও। কালা জাহাঙ্গীর বা সুব্রত বাইন শুভ্রদের মাস্তান বাহিনী তো আছেই। এই

সবজির মূল্য বৃদ্ধির নমুনা

স্থান : চড়ুই বিল শৈলকুপা			স্থান : কাওরান বাজার আড়ত, ঢাকা	স্থান : কাওরান বাজার খুচরা মার্কেটে
		দাম	দাম	দাম
সাদা গোল বেগুন	প্রতি কেজি	৫/৬ টাকা	৮ টাকা	১৪ টাকা
কালো গোল বেগুন	"	৮.৩০ টাকা	১০ টাকা	১৬ টাকা
লম্বা বেগুন	"	৪ টাকা	৮ টাকা	১৬/১৮ টাকা
জালি	প্রতি পিস	৩ টাকা	৭ টাকা	১০/১২ টাকা
কাঁচা মরিচ	প্রতি কেজি	৮ টাকা	১১ টাকা	৬০ টাকা
লাউ	প্রতি পিস	৪/৫ টাকা	১২ টাকা	২০ টাকা
শশা	প্রতি কেজি	৩.৫০ টাকা	৭ টাকা	১২/১৪ টাকা
ওল	"	৪ টাকা	৭ টাকা	১২/১৪ টাকা
ঝিঙ্গা	"	২.৮০	৬ টাকা	১২ টাকা
পটল	"	২.৫০	৬/৭ টাকা	১০ টাকা
কচু	"	৪ টাকা	৬ টাকা	১০ টাকা

এই মূল্য তালিকা ৪ সেপ্টেম্বরের

কাওরান বাজার খুচরা মার্কেটের পণ্যমূল্য আর ঢাকার সার্বিক বাজারের চিত্র এক নয়

এতোগুলো মাস্তান শ্রেণীর অস্তিত্ব যদি না থাকতো, তাহলে কেমন হতো বাংলাদেশের মানুষের জীবন?

লেখা শুরু করেছিলাম 'ইউটোপিয়া' জগতের কথা দিয়ে। লেখক টমাস মুর তার 'ইউটোপিয়া' উপন্যাসে এমন একটা দ্বীপ কল্পনা করেছিলেন, যেখানে সব সম্পদের মালিক জনগণ, সেখানে পুরোপুরি সুখ-শান্তি বিরাজমান। উপন্যাসে তিনি শোষিত মানুষের ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের কথা বলেন, কাল্পনিক স্বর্গের স্বপ্ন দেখান।

বাংলাদেশ মাস্তানমুক্ত হলেও সব সম্পদের মালিক হয়তো জনগণ হতো না। তবে মানুষের জীবনে সুখ এবং শান্তির কমতি থাকতো না। ইউটোপিয়া জগৎ শুধু কল্পনায় নয়, বাস্তবেও দেখা যেত।

সেই জগৎটা, সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ একেবারে অলীক নয়, মানে আমাদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তা বন্দি মাস্তান, পুলিশরূপী মাস্তান আর গডফাদারদের হাতে। জিম্মি হয়ে আছে বাংলাদেশ। ওপরে ওঠার সিঁড়ি প্রতিদিনই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বরং উল্টো আমরা আরো নিচে নামছি। জনগণও জিম্মি হয়ে আছে এই মাস্তানদের হাতে। আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়েই তারা প্রতিদিন হিমশিম খাচ্ছে। অথচ এই বিরাট ব্যয়ের অন্যতম কারণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মাস্তানি। মাস্তানির প্রভাব, চাঁদাবাজির কারণে আমাদের যাপিত জীবন কীভাবে ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে তা অনুসন্ধান করে সাপ্তাহিক ২০০০। '৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হয় যেভাবে' ও 'দিনে ১৬ লাখ টাকার চান্দা' শিরোণামে দুটি ভিন্ন ঘটনা নিয়ে দুটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হয় যেভাবে

রিপোর্ট করেছেন সাইফুল হাসান, ছবি : আনোয়ার মজুমদার

সবজির দাম কেন বাড়ে? সাপ্তাহিক ২০০০ এর কারণ অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। কিন্তু কোথায় প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদন হয়? দেশের কোন এলাকা থেকে সবজি ঢাকায় আসে? এ সংক্রান্ত সঠিক কোনো তথ্য জানা ছিলো না। কারওয়ান বাজার আড়তে গেলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছিল দেশের সব এলাকার বেপারিরা এখানে সবজি সরবরাহ করে। একটা চেইনের মাধ্যমের সব জায়গার সবজি ঢাকায় এসে পৌঁছায়। কোন এলাকা থেকে বেশি বা কম। তাও নির্ভর করে এলাকাভিত্তিক ফলনের ওপর। এক রকম অন্ধকারে পথ খোঁজার মতোই ৩ সেপ্টেম্বর এই প্রতিবেদক ও ফটো সাংবাদিক আনোয়ার মজুমদার কুষ্টিয়াগামী এসবি পরিবহনে উঠে বসি। পেশাগত কাজে কুষ্টিয়া যাবার পথে আগে কয়েক জায়গায় রাস্তার ধারে সবজি বেচাকেনা করতে

এভাবেই ফেরিঘাটে ট্রাক থেকে চাঁদা নেয় মাস্তান ও পুলিশ

৭ টনি ট্রাকে ১৬ টন লোড, কাওরান বাজারে রোজদার আলীর সবজি নামছে

দেখেছি। শুধু এই তথ্যের ওপর নির্ভর করে শেষ বিকেলে শেখপাড়া বাসস্ট্যান্ডে নেমে পড়ি।

শেখপাড়া, কুষ্টিয়া সীমান্তে ঝিনাইদহ জেলার শেষ বাস স্টপ। এক সময় নিষিদ্ধ রাজনীতির সুতিকাগার বলে এলাকাটির খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতি অবশ্য কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোরসহ পুরো খুলনা বিভাগেরই আছে বলা যায়। যা এখনও বর্তমান। নিষিদ্ধ রাজনীতির তিন জীবন্ত কিংবদন্তি গোলাম মোস্তফা, আলী ও রবির বাড়ি এ এলাকাতেই খুলনা বিভাগে। তিনজনের কেউ রাজনীতিতে না থাকলে এলাকাটি এখনও সন্ত্রাসপ্রবণ বা নিষিদ্ধ রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণেই।

অপরিচিত এলাকা। লোকজন সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ কুশল বিনিময়ের নামে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও ছাড়ছে না। লোকজনের জিজ্ঞাসাবাদে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে স্থানীয় একটি হোটেল নন্দী বাবুর দোকানে আশ্রয় নিলাম। স্থানীয়রা তাকে মানে বলেই মনে হলো। নন্দী বাবুকে শেখপাড়া আগমনের উদ্দেশ্য খুলে বললাম। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তার হোটেলে বসিয়ে রাখলেন। অন্যদের নজর থেকে আমাদের আড়াল করাই তার উদ্দেশ্য। শেখপাড়াতে অপরিচিত লোক কি পরিমাণ হেনস্থার শিকার হয়, মাত্র দু'দিন আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ দিলেন। বাজারে বোডিং থাকলেও তিনি আমাদের একজন কৃষকের বাড়িতে রাত কাটানোর পরামর্শ দেন । রাতে হোটেলে খাওয়া দাওয়ার পর তিনি একজন কৃষককে সঙ্গে দিলেন। যার বাড়িতে রাত যাপন করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষক অতিথি পরায়ণ তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেলো।

নন্দী বাবুই জানালেন যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে সবজির চাষ হয়। এক একদিন এক এক জায়গায় হাট বসে। ৩ সেপ্টেম্বর শেখপাড়া হাট শেষ। পরদিন ওখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে চড়ুই বিলে সবজির হাট বসবে। অন্য সব হাটের তুলনায় সবচেয়ে ছোট সবজির হাট এটি। শেখপাড়া থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে বসন্তপুর গ্রামে রাতযাপন করলাম। ফজরের আজানের সময় বেরিয়ে পড়লাম মাঠে। গৃহকর্তা আব্দুল বারিকের আত্মীয় সম্পর্কিত যুবক শামীম সঙ্গে ছিলেন।

মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম শুধুই সবজির চাষ। বেগুন, পটল, জালি, ওলকচু, কচু, ঝিঙ্গা, মরিচ আর কত সব সবজিতে এক একটি মাঠ বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছে। অনেকগুলো মাঠ ঘুরে দেখা গেলো কৃষক বেগুন চাষ করছে তুলনামূলকভাবে বেশি। ভ্যানচালক রশীদকে আমাদের সঙ্গী করে নিলাম। সারা দিন তার ভ্যানেই মাঠ, বাজার ঘুরে দেখলাম।

নিজের ক্ষেতে বেগুন তুলছিল মির্জাপুর গ্রামের ৪০ বছরের কৃষক আব্দুল কাদের। তাকে সাহায্য করছে স্ত্রী, পুত্র ও একজন ক্ষেতমজুর। ৭ কাঠা জমিতে সে বেগুন চাষ করেছে। আগে ৮ হাজার টাকার বেগুন বিক্রি করেছে। আব্দুল কাদের জানালেন, 'বেগুন চাষ প্রচন্ড পরিশ্রম আর

ব্যয়বহুলও বটে। চাষটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। বেগুন চাষ করে কেউ পয়সাওয়ালা হচ্ছে, কেউ ফকির। ভাগ্যটা এখানে বড় ব্যাপার।' কথা প্রসঙ্গে জানা গেলো গতবারের তুলনায় এ বছর ফলন কম। তার ওপর বাজারে দামও কম। বিশাল বিশাল ৩ বস্তা ও একঝুড়ি বেগুন তুলেছে তারা চড়ুইবিল বাজারে বিক্রির জন্য। আব্দুল কাদেরের সঙ্গে চড়ুইবিল বাজারে এলাম। ৩ বস্তা বেগুনের বাজার পর্যন্ত ভ্যান ভাড়া দেয়া লাগলো ৩০ টাকা। বিভিন্ন এলাকার শত শত কৃষক ভ্যানে, মাথায় করে সবজি নিয়ে বাজারে আসছে।

বেপারিরা এদিক ওদিক ঘুরছে, দাম জিজ্ঞেস করছে কিন্তু কিছুই কিনছে না। আব্দুল কাদের জানালেন, 'ঢাকা থেকে মোবাইলে নির্দেশ পাবার পর বেপারিরা মাল কেনা শুরু করবে।' বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম সবজি নিয়ে কৃষকদের সরগরম বাড়ছে। ৯টার দিকে বেচাকেনা শুরু হলো। বেপারি আসছে, দাম বলছে কিন্তু আব্দুল কাদের বেগুন বিক্রি করতে পারছে না। সে দাম চাচ্ছে ৮ টাকা কেজি। বেপারি ৫ টাকার বেশি দাম বলছে না। আব্দুল কাদেরের মতো অন্য কৃষকরাও দাম না পাওয়ায় উত্তেজিত। কিন্তু অসহায় কারণ বেপারি পণ্য না কিনলে সে টাকা পাবে না।

উপরে স্পট : মধুখালি বাজার। বিএনপি শ্রমিক দলের চাঁদা আদায়। বাঁয়ে স্পট : ফরিদপুর মোড়। সবজির ট্রাক থেকে চাঁদা নিচ্ছে পুলিশের লোক। নিচে চড়ুই বিল বাজারের বেপারী রোজদার আলী ও তার ফড়িয়ারা লাউ কিনছে।

কৃষকের লস চারদিকে

দাম না পেয়ে কৃষকরা বেপারিদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। লাভ হচ্ছে না। সব বেপারির একই কথা এ সিজনে তারা লস করেছে, ঢাকায় সবজির দাম কম। পণ্য যারা কিনবে তারা কেউ মূল বেপারি নয়। এরা বেপারির ফড়িয়া। প্রচন্ড রোদে আব্দুল কাদের ঘামছে, উত্তেজিত হয়ে পড়ছে কিন্তু কম দামে বেগুন বিক্রি করবে না। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়পক্ষই নাছোড়বান্দা। অনেক কষ্টে ৬ টাকা কেজিতে আপোস রফা হলো। আব্দুল কাদেরের ৩ বস্তায় প্রায় ৮ মণ বেগুন হলো। এর মধ্যে ৩ কেজি প্রতি মণে বাদ। কারণ জানতে চাইলে আব্দুল কাদের জানালো, মণে দুই কেজি পোকার কারণে বেপারিরা বাদ দেয়। দুই কেজির ক্ষতিপূরণ নেয়া হয় এক কেজি অতিরিক্ত ধরে। অর্থাৎ কৃষক প্রতিমণে ৩ কেজির টাকা কম পায়। বেগুন বিক্রি করে আব্দুল কাদের পেলো ১৭৭০ টাকা। এর মধ্য থেকে বেপারি ৭০ টাকা কেটে রাখলো খাজনা বাবদ। এই নিয়ে বেপারির সঙ্গে তার হাতাহাতি অবস্থা প্রায়। আব্দুল কাদেরের বক্তব্য, প্রতি মণে ৩ কেজি লস দেবার পর আবার খাজনা দেবো কেন? বেপারির পাল্টা যুক্তি এই নিয়মেই বছরের পর বছর চলছে আজ অন্য নিয়ম হবে কেন? ফড়িয়াদের সঙ্গে পেরে না উঠে ১৭০০ টাকা নিয়ে আব্দুল কাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আব্দুল কাদেরের মতো অন্য কৃষকরাও একই সমস্যায় চিল্লাচিল্লি করে ফিরে যাচ্ছেন। হিসাব করে দেখা গেলো কৃষক দু'ভাবে ঠকছে। একদিকে মণে ৩ কেজি লস দেয় অন্য দিকে বেপারি খাজনার নাম করে কৃষকের কিছু টাকাও রেখে দেয়। অর্থাৎ একজন বেপারি এক হাজার মণ পণ্য কিনলে ৩ হাজার কেজি মাল অন্যায়ভাবে আদায় করে। অন্যদিকে খাজনা বাবদ টাকা কাটার ব্যবস্থা তো আছেই। বাজারে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেলো খাজনা দেবার নিয়ম বেপারিদের। সেটা তারা দেয়ও। কিন্তু কৌশলে টাকাটা নেয় তারা কৃষকের কাজ থেকে। এ হিসেবে কৃষক ঠকে চারদিক থেকে। বাড়ি ফেরার সময় আব্দুল কাদের সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমার ক্ষেত থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত বেগুন পাবো। আরো হয়তো ১৫/২০ হাজার টাকার বেগুন বিক্রি হবে। কিন্তু এতে খুব একটা লাভ হয় না। বেগুন চাষে যে পরিশ্রম আর ব্যয় তাতে কৃষক কেজিতে ১০ টাকা পেলে লাভবান হতো।' কৃষক চিরকাল ঠকবে, বাংলাদেশে এটা তার নিয়তি। এই নিয়তি খন্ডাবে কে?

৪ সেপ্টেম্বর চড়ুইবিল বাজার ও পণ্য মূল্য

আব্দুল কাদের বাড়ি ফেরার পর বাজার ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। চড়িয়া গ্রামের কামরুল এসেছে ৫০টি জালি ও ৩০টি লাউ নিয়ে। ফড়িয়ার সঙ্গে কামরুলের বাদানুবাদ

হচ্ছে। এমন সময় কামরুলের কাছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'কৃষক দাম পায় না, ৩ টাকার জালি ঢাকায় গিয়ে ১৫ টাকা হয় কিভাবে? কামরুলের উত্তরের আগেই ফড়িয়া ক্ষেপে উঠলো। কে বলেছে ঢাকায় জালি ১৫ টাকা? গতকালও ঢাকায় জালি বিক্রি হয়েছে ৩.৫০ টাকা থেকে ৪ টাকার মধ্যে।' মজার ব্যাপার হলো, ফড়িয়া যে দিনটি নির্দেশ করছে সেদিনই এই প্রতিবেদক বাজার থেকে একটি জালি কিনেছে ১২ টাকায়। ফড়িয়াকে এ তথ্য দেবার পর সে আরও ক্ষেপে উঠলো। আপনি কে? কেন লোকজনকে ভুল তথ্য দিচ্ছেন? কেনাকাটার

সময় কেন ঝামেলা করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাজার ঘুরে দেখা যায়, প্রতিটি লাউ বিক্রি হচ্ছে ৪-৫ টাকা, জালি ৩ টাকা, মরিচ ১০ টাকা কেজি, শসা ১৫০ টাকা মণ, কচু-১৪৫ টাকা মণ, ঝিঙ্গে ৯০ থেকে ১০০ টাকা মণ, সাদা বেগুন ৬ থেকে ৬.৫০ টাকা কেজি, লম্বা বেগুন ৪ টাকা, কালো গোল বেগুন ৬ টাকা কেজি, ওলকচু ৩ থেকে ৪ টাকা কেজি। কৃষকরা অনেক কাকুতি-মিনতি করছে কিন্তু দাম বাড়ছে না। বেপারিরা সংঘবদ্ধভাবে দাম বাড়াচ্ছে বা কমাচ্ছে। অর্থাৎ সবজি উৎপাদনকারী কৃষকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে স্থানীয় পাইকাররা।

একজন রোজদার আলীর গল্প

রোজদার আলী বেপারি। বাড়ি পার্শ্ববর্তী রানীনগর গ্রামে। আশপাশে কয়েকটি হাটের তিনিই সবচেয়ে বড় বেপারি। সবচেয়ে বেশি টাকার সবজি তিনি কেনেন। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখা গেলো, একটি ভ্যানে দাঁড়িয়ে একজন লাউ বিক্রেতার সঙ্গে বচসা করছেন। ফড়িয়ার কাছে প্রতিটি লাউ বিক্রেতা ৫ টাকা গড়ে বিক্রি করেছে। কিন্তু বেপারি লাউ বেছে বেছে নেবে। ফরিদ বেপারিকে বারবার জানাচ্ছে যে গড়ে সবগুলো লাউ বিক্রি করেছে। বেপারি কোনোভাবেই সব লাউ নেবে না। একটু বয়স বেশি এমন সবগুলো লাউ বেপারি বাদ দিয়ে দিলো। অসহায় ফরিদের প্রায় ২৫টি লাউ বাছাই প্রক্রিয়ায় বাদ পড়লো। কথা প্রসঙ্গে সে জানালো এই লাউ নষ্ট হবে, কোথাও বিক্রি করতে পারবো না। ঝগড়া শেষে বিজয়ীর বেশে রোজদার আলী আমাদের দিকে নজর দিলেন। নাম-পরিচয় জেনে রোজদার আলী জানালেন কেনাবেচায় ব্যস্ত ২টার পরে আসেন। তখন কথা বলবো।

সময়মতো তার কাছে হাজির হলাম। রোজদার আলী এই এলাকার একমাত্র বেপারি যিনি অনেক রকম সবজি কেনেন। সবজির দাম কেন বাড়ে? প্রশ্ন শুনে রোজদার আলীর বিগলিত হাসি আর উত্তর, 'বাড়ে নাকি?' এই সিজনে দেড় লাখ টাকা লসে আছি। সবজির দাম বাড়লে তো বেঁচেই যেতাম।' তারপর তিনি একটা ব্যাখ্যা দিলেন। পণ্যের মূল্য বাড়ার কারণ রোজদার আলীর ভাষায়, 'দেখেন কাঁচা মালের ব্যবসা মানেই ঝুঁকি। পথে ট্রাক বিকল হয়ে এক দিন পড়ে থাকতে পারে। ঘাটে জ্যামে আটকে থাকতে পারে। তাহলে মাল পচে যাবে। এছাড়াও ধরেন আজকের বাজারে আমার ৩০ জন লোক খাটছে মাল কেনার জন্য। দিন শেষে তাদের দিতে হবে ৪ হাজার টাকা, খাজনা দিতে হবে ১ হাজার টাকা, হাটের লেবার আছে তাদের দিতে হবে ১ হাজার টাকা, নিজেদের খাওয়া-দাওয়া ৩০০ টাকা, গাড়ি ভাড়া ৯ হাজার টাকা। ঢাকায় আড়তদারের ওখানে প্রতি ১ হাজার টাকার মালের জন্য দিতে হবে ৬০ টাকা। এবার বোঝেন কত টাকা খরচ হয়। এখানেই তো প্রতি মণে ৩-৪ টাকা বেড়ে যায়। এক ট্রাক মাল ঢাকা পাঠাতে প্রায় ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে ঢাকা পৌঁছাতে পৌঁছাতে কিছু মাল নষ্ট হয়। সুতরাং কিছু দাম তো বাড়বেই।' পথে চাঁদার কারণে কত দাম বাড়ে? রোজদার আলী অবশ্য পথে চাঁদা দেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, 'আমার কাজ এখান থেকে পণ্য কিনে ঢাকায় পাঠানো। ওখানে লোক আছে। তারা আড়তে মাল বিক্রি করে টাকা পাঠায়। আমার চাঁদা দেবার কিছু নেই।' যা হোক আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম রোজদার আলীর সবজির গাড়ির সঙ্গে ঢাকায় যাবার। প্রয়োজনে ঐ ট্রাকেই। কিন্তু রোজদার আলীকে কিছু জানালাম না। কারণ কোনোভাবেই তিনি রাজি হবেন বলে মনে হলো না।

চড়ুই বিল কাঁচা বাজারে শত শত কৃষক এভাবে সবজি নিয়ে আসে। কেউই সবজির ন্যায্যমূল্য পায় না

হিসাবের গরমিল

ব্যবসায়ী ব্যবসায় লাভ করবে এটা খুবই ন্যায়সঙ্গত। রোজদার আলীর দেয়া হিসাবে অনেক গরমিল রয়েছে। যেমন এই বেপারি জানিয়েছেন ট্রাক ভাড়া ৯ হাজার টাকা। কিন্তু ট্রাক ড্রাইভার আমাদের জানিয়েছেন, তার গাড়ি ভাড়া ৭ হাজার টাকা। ভাড়া আরও কম হতে পারে। ব্যবসায়ীদের কারণেই সেটা হয় না। ট্রাকের লোড ক্ষমতা ৭ টন। কিন্তু লোড দেয়া হয় ১৪ থেকে ২০ টন। অতিরিক্ত পণ্য পরিবহনের জন্যই ভাড়া বৃদ্ধি হয় বলে ট্রাক ড্রাইভারের ধারণা। রোজদার আলী হিসাব দিয়ে বলেছেন, আনুষঙ্গিক খরচের কারণে মণে ৩-৪ টাকা খরচ বাড়ে। বাস্তবতা হলো ৪ সেপ্টেম্বর তিনি যে টাকার পণ্য কিনেছিলেন সে হিসাব অনুযায়ী মণপ্রতি ১ টাকারও কম বৃদ্ধি পায়। প্রশ্ন হলো রোজদার আলী ভুল হিসাব বা তথ্য দিলো কেন? ফড়িয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা ৮০ থেকে ১০০ টাকা পায় প্রতি দিনে। ১০-১২ মণ ওজনের বস্তাকে স্থানীয় ভাষায় বলে ঢোপ। একটা ঢোপ ভরতে লোক দরকার হয় ৩ জন। ঢোপ প্রতি বেপারির খরচ হয় ১৩০ টাকা। একটি ট্রাক লোড দিতে কুলির পেছনে সর্বোচ্চ খরচ হয় ১ হাজার টাকা। অন্যদিকে ট্রাক ঢাকায় পৌঁছানোর পর সকল খরচ আড়তদারের। পণ্য বিক্রির পর সেখান একটা কমিশন পায় আড়তদার। স্থানীয় বেপারির এর বাইরে কোনো খরচ নেই। অর্থাৎ রোজদার আলীর হিসাবের চেয়ে তার আনুষঙ্গিক খরচ কম বলেই প্রমাণিত হয়, বেপারির খরচ বাড়িয়ে দেখানোর পেছনের কারণগুলো তিনি পরিষ্কার করে বলেননি। আমরা অনুমান করার চেষ্টা করেছি কিন্তু অনুসন্ধান করিনি।

জার্নি বাই ট্রাক : চড়ুইবিল টু ঢাকা : পথে পথে চাঁদা

সবজির মূল্য বৃদ্ধির পেছনে রোজদার আলীর বক্তব্যে সন্তুষ্ট না হওয়ায় সবজির ট্রাকের ছাদে ঢাকায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। কোনো ট্রাক ড্রাইভার গাড়িতে সাংবাদিক তোলার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কয়েকজন বেপারিও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন। তাদের বক্তব্য, অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই সবজির ট্রাক সব সময় ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ঝুঁকি অ্যাকসিডেন্টের। ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার, সবার একই কথা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে কে দায়িত্ব নেবে? যখন কেউ রাজি নয় তখন অন্য পথ ধরলাম। আমরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন সবজির ট্রাকে পথে কত জায়গায় চাঁদা দিতে হয় সেটা নিজের চোখে দেখতে চাই। অনেক কষ্টে একজন ট্রাক ড্রাইভার রাজি হলো। তার নাম ধরা যাক কলিমউদ্দিন। প্রথম শর্ত হলো এক হাজার টাকা দিতে হবে। দ্বিতীয়ত ট্রাকে যাওয়া যাবে কিন্তু ছবি তোলা আর কথা বলা নিষেধ। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে তাদের যাতে ক্ষতি না হয় তার নিশ্চয়তা দেয়া। সব শর্তে রাজি হয়ে ট্রাকের ছাদে উঠে বসলাম। অতিরিক্ত পণ্য বহনকারী ট্রাকের মাথায় চড়ার অভিজ্ঞতা যে কতটা ভয়াবহ তা আসলে লিখে প্রকাশ করার নয়। প্রায় ৮ ঘন্টার জার্নিতে প্রতি মুহূর্তেই জীবন ছিলো শঙ্কার মাঝে। সবজির বস্তার ওপর বসে রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। অন্যদিকে সচেতন থাকতে হচ্ছে গাছের ডালে লেগে আবার পড়ে

না যাই। মাগুরা এসে প্রথম চাঁদার কবলে পড়লো আমাদের ট্রাক। প্রচন্ড গতিতে ট্রাক চলছে। এর মধ্যে ফটো সাংবাদিক আনোয়ার ক্যামেরা রেডি করে, এক হাতে রশি অন্য হাতে ক্যামেরা ধরে থাকলো। কামারখালী ব্রিজে ৭৫ টাকা টোল দেবার পর ট্রাক আবার যাত্রা শুরু করলো। টোল দিয়ে কিছুটা এগোতেই মধুখালী বাজারে ট্রাকের গতি ধীর হলো। গাড়ির হেলপার কেবিনের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে একজনকে টাকা দিলো। পরে জানা গেলো এটা হলো জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের চাঁদা। পরবর্তী স্পট ফরিদপুর মোড়। এই মোড়ে পুলিশ ও বিএনপি সন্ত্রাসীদের টাকা একসঙ্গে নেয়া হয়। বাস-ট্রাক, মাইক্রো, পিকআপ সব গাড়িতেই ৪০ টাকা। পুলিশের একজন লোক এগিয়ে এলে গাড়ির হেলপার আগের মতোই জানালা দিয়ে ৪০ টাকা ছুঁড়ে দিলেন। ফরিদপুর ছেড়ে রাজবাড়ী মোড়ে রাজবাড়ী পুলিশের চাঁদা ১০০ টাকা। কী নির্বিকারভাবে টাকার লেনদেন হচ্ছে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সবজির ট্রাক ফেরিতে আলাদা গুরুত্বসহকারে পার হবে এটা সরকারের নির্দেশ। কিন্তু প্রতিদিন দৌলতদিয়া ঘাটে সবজির গাড়িগুলোকে কী পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় তা সম্ভবত সরকারের কোনো সংস্থাই জানে না জানলেও নিজেদের পকেট ভারী করার জন্য না জানার ভান করে। ট্রাকের সিরিয়াল নেয়ার জন্য দালালকে দিতে হয় ৪০ টাকা, স্পেশাল সিরিয়ালের জন্য আরো ১০০ টাকা। এরপর ফেরি পারাপারের জন্য সরকার নির্ধারিত রেট হলো ৭১৪ টাকা প্রতি ট্রাক।

বিভিন্ন থানার দেয়া পুলিশের চাঁদার মাসিক টোকেন

৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হয় যেভাবে

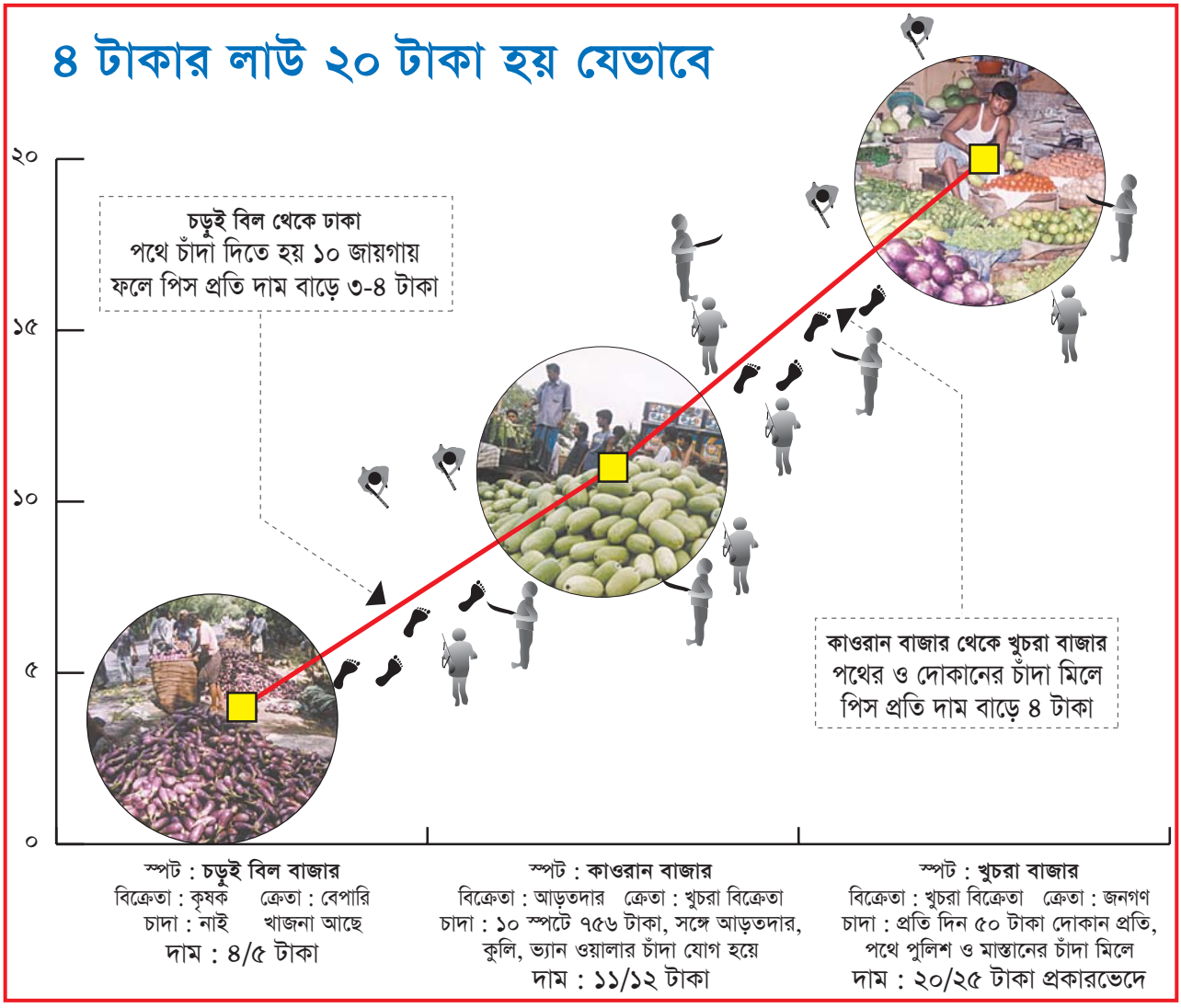

কিন্তু দৌলতদিয়া ঘাটে প্রতি ট্রাক থেকে আদায় করা হয় ৯০০ টাকা। মাস্তানদের চাঁদা ৩০ টাকা। হেলপার জানালা দিয়ে টাকা দিচ্ছে অন্যরা শুধু নিচ্ছে। পুরো পথ জুড়ে এই দৃশ্য। হিসাব করে দেখা যায়, শুধু ঘাটেই অবৈধ চাঁদা দিতে হয় ৩৫৬ টাকা। ঘাট পার হওয়ার পরও ঝামেলা কম নয়। মানিকগঞ্জে ১০০, নয়ারহাটে ১০০, সাভারে ১০০ টাকা পুলিশের চাঁদা। এই পাড়ে একটা গাড়ির বৈধ খরচ শুধু তরা সেতু পারাপার বাবদ ৩০ টাকা। ঢাকার মধ্যে সার্জেন্ট যদি এমন গাড়ি আটকাতে পারে তাহলে তো কথাই নেই। এ কারণে চার-পাঁচটি গাড়ি একসঙ্গে ঢাকার মধ্যে ঢোকে যাতে সার্জেন্টদের হয়রানির শিকার হতে না হয়। যা হোক এ দিন রাত ১১.৩০-এ কারওয়ান বাজার পৌঁছানো পর্যন্ত ঢাকার মধ্যে কোনো সার্জেন্টকে চাঁদা দিতে হয়নি ড্রাইভারকে। পরে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এর মধ্যে ঝিনাইদহ ও মাগুরা পুলিশকে মাসিক ৩০০ ও ১০০ টাকা দিতে হয়। এ জন্য কার্ড আছে। পুলিশের দেয়া কার্ডকে পরিবহনের লোকজন বলে বিট। কিন্তু অন্য জেলাগুলোতে টাকা দিতেই হয় কার্ড (বিট) থাকা সত্ত্বেও। খসড়া একটা হিসাবানুযায়ী শুধু ফরিদপুর মোড় থেকে প্রতিদিন ৮০ থেকে ১ লাখ টাকা চাঁদা ওঠে। এ টাকার ভাগ পায় পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীরা। চড়ুইবিল থেকে ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে আমাদের ট্রাকের চাঁদা দিতে হয়েছে ৭৫৬ টাকা। এই চাঁদার টাকাও সবজির ওপর থেকে ব্যবসায়ীরা তুলে নেয়। অতিরিক্ত লোড নেয়ার কারণেও অনেক সময় ট্রাক ড্রাইভারদের অনাকাঙ্ক্ষিত আরও কিছু চাঁদার সম্মুখীন হতে হয় বলে অনেক ট্রাক ড্রাইভার জানান।

পথের চাঁদাই শেষ নয় আরো চাঁদা আছে

গ্রাম থেকে সবজি ঢাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পথেই শুধু চাঁদা দিতে হয় না। এরপরও কয়েক ধাপে ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে হয়। ঢাকায় পণ্য পৌঁছানোর পর সেটি আড়তদারের ঘরে ওঠে। কারওয়ান বাজারের আড়তদারদের মাস্তান ও পুলিশকে চাঁদা দিতে হয়। কারওয়ান বাজারে ট্রাক পৌঁছানোর পর সেখানে মাল নামানো-উঠানো, ভ্যান ভাড়াসহ আড়তদারের খরচ আছে। আমরা যে ট্রাকে ঢাকায় পৌঁছি, এই ট্রাকের পণ্য শহীদুল ইসলাম নামে এক আড়তদারের ঘরে ওঠে। শহীদুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'প্রতি বস্তা মাল ট্রাক থেকে নামাতে ৫০ টাকা কুলি খরচ, ৫০ টাকা ভ্যান ভাড়া দিতে হয়। প্রতিদিন ঘর ভাড়া দিতে হয় ৯০০ টাকা। সঙ্গত কারণেই পণ্যের দাম বাড়ে। ভাইরে এ ব্যবসায় মনে হয় অনেক লাভ। ব্যাপারটা তেমন নয় অনেক লস। কর্মচারী খরচ, বিদ্যুৎ বিল অনেক খরচ ভাই'। প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয় কেমন? উত্তরে শহীদুল ইসলাম জানান, চাঁদা দিতে হয় না।

কৃষক আব্দুল কাদের পরিবারসহ সবজি বস্তাজাত করছেন বাজারে নেয়ার জন্য

আড়তদারের এই বক্তব্য সঠিক নয়। শুধু কারওয়ান বাজার কেন্দ্রিক চাঁদাবাজির ঘটনা, বন্দুকযুদ্ধ, হত্যার খবর আগে অনেকবার পত্রিকায় এসেছে। কিন্তু ভয়ে ব্যবসায়ীরা এ কথা স্বীকার করেন না। অনুসন্ধানে জানা যায়, কারওয়ান বাজারে দোকান ভেদে চাঁদার পরিমাণ ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা। এই চাঁদার একাংশ পুলিশ, অন্য অংশ মাস্তানদের পকেটে যায়। আড়তদাররা প্রয়োজনীয় খরচের সঙ্গে চাঁদার টাকাটাও লাভের সঙ্গে তোলেন। আড়তদারদের কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতারা পণ্য কিনে ঢাকার জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। শহীদুল ইসলামের আড়তের কাছেই দু'জন খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে কথা হয়। এদের একজন রমজান আলী, অন্যজন মোহাম্মদ আলী। একজন গোড়ান, অন্যজন মোহাম্মদপুর এলাকায় ব্যবসা করেন। এই খুচরা বিক্রেতাদের একজন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, '৩ হাজার টাকার সবজি কিনেছি। পাল্লার চাঁদা, মিনতি ও ভ্যান ভাড়া বাবদ চলে যাবে ৫০০ টাকার ওপরে। পথে মাস্তানের পাল্লায় না পড়লেও পুলিশকে ৫ টাকা হলেও দিতে হয়। বাজারে বিএনপির লোকদের প্রতিদিনকার চাঁদা ৩০ টাকা। এখন আপনি বলেন, ব্যবসা করতে হলে দাম না বাড়িয়ে কি করবো?' অন্যজন প্রতিদিন ৫০ টাকা চাঁদা দেবার কথা স্বীকার করেন। দেখা যাচ্ছে, শুধু চাঁদার কারণে সবজির দাম বাড়ছে কয়েক গুণ। এর বাইরে কারওয়ান বাজারে কুলিদেরও চাঁদা দিতে হয়। বাজারে ভ্যানে যারা পণ্য টানে তাদেরও চাঁদা দিতে হয় পুলিশকে। জানা যায়, ভ্যানচালকদের চাঁদা ১০ টাকা প্রতিদিন। কুলিরা গ্রুপ প্রতি কত টাকা চাঁদা দেয় তার খবর অনেক চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। তবে চাঁদা দিতে হয় এটা সত্য। এই দুই শ্রেণী চাঁদার কারণে তাদের পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেয়। যার প্রভাব পড়ে সবজির মূল্যের ওপর।

মূল্যের হেরফের আকাশ-পাতাল : কারণ চাঁদা

রোজদার আলী ট্রাকে মোট কত টাকার পণ্য পাঠিয়েছেন তার একটা চালান কপি সাপ্তাহিক ২০০০ সংগ্রহ করে। চালান অনুযায়ী ৪ সেপ্টেম্বর রাতে ঝিনাইদহ-ট সিরিজের ট্রাকে আসে বেগুন ৮৫ মণ, লম্বা বেগুন ৭৫ মণ, পটল ৩১.৬ মণ, মরিচ ১৬.৩৪ মণ, ওলকচু ৬২ মণ, জালি ১৭৭৫টি, লাউ ৪৬৫টি। রোজদার আলী বেপারির ক্রয়কৃত মোট পণ্যের মূল্য ৭০ হাজার ৪৬০ টাকা।

আড়তে পণ্য নামতে নামতেই বেচাকেনা শুরু হয়ে যায়। দেখা যায় ৬ টাকা মূল্যের বেগুন কারওয়ান বাজারে পাইকারি বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়, লম্বা বেগুন ৮ টাকায়, পটল ৬ টাকায়, ওলকচু ৭ টাকায়, জালি প্রকার ভেদে ৭/৮ টাকায়, লাউ ১০ টাকায়, মরিচ ১১-১২ টাকায়, কচু প্রতিটি ৭ টাকা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। গ্রাম থেকে পাইকারি মূল্যে কেনা সবজি ঢাকায় পৌঁছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মণ, কেজি বা পিস প্রতি ৫০ থেকে ৩০০ শতাংশ হারে মূল্য বেড়ে গেছে। পরিবহন ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে ঢাকায় কোনোভাবেই পণ্যের মূল্য ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু তা হচ্ছে না, তার অন্যতম কারণ চাঁদাবাজি। গ্রাম থেকে আসা পণ্য আবার যখন খুচরা বিক্রেতার কাছে যাচ্ছে তখন দাম বাড়ছে ৫০০ শতাংশের মতো। পণ্য পরিবহনকারী ১০-১২ জন ট্রাক ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপকালে প্রত্যেকেই স্বীকার করেন, শুধু রাস্তায় চাঁদার কারণে ট্রিপ প্রতি ভাড়া বাড়ে ২ হাজার টাকা। অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা ভয়ে স্বীকার না করলেও চাঁদার টাকা তোলার জন্যই যে তারা ইচ্ছামতো সবজির মূল্য বৃদ্ধি করছেন এটা না বোঝার কোনো কারণ নেই। ভূমি থেকে ঢাকার আড়ত, আড়ত থেকে ঢাকার বিভিন্ন কাঁচাবাজার পর্যন্ত পৌঁছাতে এক ট্রাক সবজির পেছনে গড়ে ২০০০ থেকে ২৫০০ টাকা চাঁদা দেয়া লাগে। এ হিসাবে দেখা যায়, গড়ে মণপ্রতি দাম বেড়ে যায় ৪-৫ টাকা। ব্যবসায়ীরা এ ক্ষতি পোষানোর জন্য কেজি প্রতি ৩-৪ টাকা দাম বাড়িয়ে দেয়। কাঁচাবাজারে পণ্যের মূল্য নিম্নবিত্ত ও

উচ্চবিত্তের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। তারপরও বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে খেতে হয় এবং পণ্য কিনতে হয়। এতে সাধারণের জীবন ওষ্ঠাগত হয়। তারপরও রাজনীতিবিদের হাঁক-ডাক কমে না। এটাই বাংলাদেশের স্বাভাবিক চিত্র।

৪ সেপ্টেম্বর রাতে কারওয়ান বাজারের পাইকারি বাজারে সবজির মূল্য দেখে পাশেই খুচরা বাজারে যাই পণ্যের তুলনামূলক দাম দেখতে। কারওয়ান বাজারে খুচরা বিক্রেতা মোঃ শাজাহান। শাজাহানের দোকানে পটল বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ৬ থেকে ১০ টাকা। ঝিঙ্গা ১২ টাকা, জালি প্রকারভেদে ১০ থেকে ১৫ টাকা, লাউ প্রকারভেদে ২০ থেকে ২৫ টাকা, কচু ১০ টাকা, কাঁচামরিচ ২০ টাকা, বেগুন গোল ১৬ টাকা, লম্বা ১২ টাকা, ওলের হিসাব পাওয়া যায়নি। এই হিসেবে ঢাকার খুচরা বিক্রেতা পণ্যের কেজি প্রতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম বাড়াচ্ছে ডবল বা তারও বেশি। যদিও কারওয়ান বাজারে খুচরা বাজার ও ঢাকার সার্বিক বাজারের চিত্র এক নয়। কারণ কারওয়ান বাজারেই আড়ত থাকায় এখানকার খুচরা বিক্রেতারা অন্যান্য বাজার অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে পণ্য বেচতে পারে।

৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হয় যেভাবে

এই অঙ্কটা জটিল আবার সহজ বলা যায়। চাঁদা ও আনুষঙ্গিক খরচসহ গ্রামের পাইকারের ক্রয় মূল্য থেকে ঢাকার পাইকারদের বিক্রয় মূল্য বিয়োগ করলেই গ্রামের পাইকারের লাভ পাওয়া যায়। কৃষকের ভূমি থেকে রাজধানী কারওয়ান বাজার পর্যন্ত সবজি পাঠিয়ে গ্রামের পাইকারের যে অনেক লাভ হয় ব্যাপারটা তা নয়। চড়ুইবিল থেকে ঢাকা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছাতে সবচেয়ে বেশি লাভবান পুলিশ, চাঁদাবাজ ও ফড়িয়ারা। অবাক করা ব্যাপার হলো, গ্রামের ৪ টাকার লাউ ঢাকায় ১০ টাকা বিক্রি হলে সেটাকে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করা যেতো। চড়ুইবিল থেকে ঢাকার দূরত্ব ২৪৫ কিলোমিটার। এতে যতোটা চাঁদা দিতে হয়, দেখা যায় আড়ত থেকে ঢাকার খুচরা বিক্রেতাদের দোকান পর্যন্ত সবজি পৌঁছাতে চাঁদা লাগে তারও বেশি। সবজির মূল্য বৃদ্ধির এটাই অন্যতম কারণ। যে কারণে আড়তদার শহীদুল বলেন, '৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। তারপরও হচ্ছে। কি করবেন। সবজি বিক্রেতাদের তো বাঁচতে হবে।'

৪ টাকার লাউ ২০ টাকা হওয়া উচিত নয়, প্রশ্ন হতে পারে কত হওয়া উচিত। পুরো পথ পরিক্রমায় সাপ্তাহিক ২০০০ হিসাব করে দেখেছে শুধু চাঁদা বাদ দিলে ঢাকায় একজন ক্রেতা ১০-১২ টাকার মধ্যে লাউ পেতে পারেন। বেগুনের খুচরা মূল্য হওয়া উচিত ১২ টাকা সর্বোচ্চ, জালির মূল্য সর্বোচ্চ ৭ টাকা। কিন্তু তা হবার নয়, কারণ পথে চাঁদা, দোকানে চাঁদা। এসব চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারলে ঢাকার বর্তমান বাজার মূল্যের তুলনায় সবজি

ঢাকার আসার আগে একাধিক ট্রাক বোঝাই হচ্ছে চড়ুই বিল বাজারে

পটলের ঢোপ সাজাচ্ছে দুই সাজুনি

প্রায় অর্ধেক মূল্যে পাওয়া সম্ভব। কারণ দেশে সবজির উৎপাদনে কোনো ঘাটতি নেই। কৃষক এতো পরিশ্রম করে সবজি উৎপাদন করে অথচ তারা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না, ক্রেতারাও অন্যায্য মূল্যে সবজি কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এখন সরকার যদি এসব চাঁদাবাজি বন্ধের উদ্যোগ না নেয় তবে দাম আরো বাড়বে বৈ কমবে না।

মধ্যবিত্তের বাজেটে চাঁদার প্রভাব

ধরা যাক একজন মধ্যবিত্তের মাসিক বাজার খরচ ৩ হাজার টাকা। এই টাকার ২ ভাগ সে কাঁচা বাজার বাবদ ব্যয় করে অনুমান করা যায়। প্রশ্ন হতে পারে সবজির ওপর চাঁদাবাজি মধ্যবিত্তের বাজার বাজেটে কতটা প্রভাব ফেলে। চড়ুইবিল বাজার থেকে রোজদার আলী বেপারি যে পণ্য ঢাকায় পাঠিয়েছিল, সেই পণ্যের মূল্য হিসাব করে একটা আনুমানিক হিসাব বের করা হয়েছে। গড় হিসাব করলে দেখা যায়, চড়ুইবিল থেকে মোহাম্মদপুর পর্যন্ত এক ট্রাক সবজি পৌঁছাতে চাঁদা দিতে হয় ২ হাজার টাকা। ঢাকার আড়তে পণ্যের মূল্য হিসাব করে দেখা গেছে ব্যবসায়ীরা শুধু চাঁদার কারণে পণ্যের মূল্য কেজি প্রতি বা পিস প্রতি ২ থেকে ৫ টাকা বৃদ্ধি করছে। ঢাকার স্থানীয় খুচরা বিক্রেতারা চাঁদার কারণে কেজি প্রতি দাম বাড়াচ্ছে একই হারে। একজন মধ্যবিত্ত যদি দিনে ১টি লাউ, ১ কেজি, ঝিঙ্গা, ১ কেজি বেগুন, একপোয়া মরিচ, ২ কেজি আলু, ১ কেজি কচু বা পটল, ১ কেজি শাক কেনে তবে তার খরচ হবে উপরের বাজারের তালিকা অনুযায়ী মধ্যবিত্তের প্রতিদিনের বাজার খরচ দাঁড়াচ্ছে গড়ে ৯০ থেকে ১০০ টাকা। চাঁদার সূচক হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে শুধু মাত্র খুচরা বিক্রেতাদের চাঁদা বাবদ লাউয়ের জন্য খরচ হচ্ছে ৫/৬ টাকা। ঝিঙ্গায় ৩ টাকা, বেগুনে ১ টাকা, মরিচে ১ টাকা, আলুতে ২ টাকা, পটলে ১ টাকা, শাকে ২ টাকা- অর্থাৎ ১০০ টাকার সবজি কিনলে মধ্যবিত্তকে চাঁদা দিতে হচ্ছে ১৫ টাকা। বাজারের তালিকা দীর্ঘ হলে চাঁদার অঙ্কের পরিমাণও বাড়বে। এ হিসাবেই মাসিক বাজেটের ৪৫০ টাকা মধ্যবিত্তের অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিদিনকার বাজার হিসাব অনুযায়ী মধ্যবিত্তের বাজার বাজেটের ২২.৫ শতাংশ খরচ হয় শুধু চাঁদার কারণে। ঢাকার বিভিন্ন বাজারের পণ্যের মূল্যকে গড় হিসাব ধরে কেজি প্রতি একটি দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সড়ক ও আড়তের চাঁদাবাজি এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেটি করলে দেখা যায় মধ্যবিত্তের ১০০ টাকার বাজারে চাঁদা দিতে হয় ৩৭ থেকে ৪০ টাকা।